শাফিন রাশেদ এর ধারাবাহিক কিশোর উপন্যাস

‘ফাহিমের একাত্তর’

(দ্বিতীয় কিস্তি)

২

একরাতে হঠাৎ করে ফাহিমের মা ফাতেমা বেগম মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন।
মর্জিনা ও ফিরোজ দৌড়ে গিয়ে মাকে মাটি থেকে তুলল। শুইয়ে দিল বিছানায়। ওরা এক সময় খেয়াল করল, মা মুখ দিয়ে গড়গড় আওয়াজ করছেন। কিন্তু কথা বলতে পারছেন না।
পাশের ঘর থেকে পারুল চাচি ছুটে এলেন। ফাহিমের মেজো চাচাও এলেন এক সময়। তাঁর এক সময় একটা ঔষধের দোকান ছিল। উনি রুগী দেখে কিছু কিছু অনুমান করতে পারেন। তার ধারণা হলো, ভাবি স্ট্রোক করেছে।
ফাতেমা বেগমের উচ্চ রক্তচাপ আছে। ডাক্তার ঔষধ দিয়েছিল। কিন্তু ওষুধ নিয়মিত খাওয়া হয় না তাঁর। ফাহিমের চাচার ধারণা, ওই রক্তচাপ থেকে এমনটা হয়েছে।

কী করা যায় এখন ? জানতে চাইল ফিরোজ ।

-হাসপাতালে নিতে পারলে ভালো হতো। বললেন ওদের মেজো চাচা। অন্ততঃ ডাক্তার দেখানো তো দরকার।

ফাহিম দেখল, মর্জিনা আপা কাঁদতে শুরু করেছেন। মানুষজন আস্তে আস্তে বাড়তে শুরু করল। ফিরোজ অনুভব করল, কিছু একটা করা দরকার। কিন্তু মাথায় কিছুই আসছে না।

পরের দিন সকালে মজিদ সাহেবকে খবর দিতে একজনকে পাঠানো হলো বরিশাল। বিকেলের দিকে ফাহিমকে ঈশারায় ডাকলেন ফাতেমা বেগম।

-মা বলো, কিছু লাগবে তোমার ?

ফাতেমা বেগম ফিসফিস করে বললেন, একটু পানি দে। ফাহিম পানি আনতে ছুটল। মর্জিনা চিৎকার দিয়ে উঠল, ভাইয়া, মা কথা বলছে। তাড়াতাড়ি আসো। পাশের ঘর থেকে ফিরোজ দৌড়ে এলো। বসল মায়ের পাশে। বলল, মা, এখন কেমন আছো তুমি?

-ভাল বাবা। পানি খেলেন ফাতেমা বেগম। তবে সামান্য। ফিরোজ খেয়াল করল, মা তার হাতটি ধরে আছে। ফিরোজ বলল, মা, কিছু কি লাগবে ?

-না। তবে আমার একটা কথা আছে বাবা। তোকে আমি একটা কথা বলব। শুনবি তো আমার কথা।

-বল মা। কি কথা।

-আগে কথা দে, যা বলবো, মেনে চলবি ?

-আচ্ছা বল। আমি তোমার কথার অবাধ্য হবো না।

-তুই কখনো আমাদের ছেড়ে চলে যাবি না। ঠিক আছে ?

ফিরোজ চুপ করে থাকলো কিছুক্ষণ। তারপর বলল, মা, তুমি কী বলতে চাচ্ছো ?

-তুই যুদ্ধে যাবি না। তুই যুদ্ধে গেলে আমি বাঁচবো না।

-আচ্ছা, ঠিক আছে মা। আমি যুদ্ধে যাবো না। তুমি এখন বিশ্রাম নাও। ঘুমাও।

রাতে মজিদ সাহেব বাড়ি এলেন। ফাতেমা বেগম তখন প্রায় স্বাভাবিক। তবে বাম পায়ে খানিকটা দুর্বলতা আছে। মজিদ সাহেবকে ঘরে ঢুকতে দেখে স্বস্থির একটা নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি। তারপর ঘুমের রাজ্যে চলে গেলেন। স্বপ্নে দেখলেন, বাড়িতে পটকা ফুটিয়ে আনন্দ করা হচ্ছে। বিয়ের আনন্দ। কার বিয়ে, কেউ তাকে তা বলছে না। কেন ?

পটকার শব্দগুলো আসলে গুলির শব্দ ছিল। গাবখান নদী দিয়ে গানবোট যাচ্ছে। দুপাশের গ্রামগুলোর দিকে তাক করে গুলি ছোড়া হচ্ছে। দূরে কোথাও মানুষের আর্ত চিৎকার শুনতে পেল ফিরোজ।

মে মাসের শেষ সপ্তাহ । এক সকালে ফাহিমরা নৌকায় উঠলো। বাড়ি থেকে দুইশ গজ দূরে একটা খাল। খুব সরু। তবে জোয়ারে নৌকা চলাচলের উপযোগী হয়। দুপুরে ভাটার সময় নৌকা ঢোকে না। নৌকার সামনে ও পিছনে পর্দা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাপড়ের মোটা পর্দা। সামনে পর্দার বাইরে মজিদ সাহেব বসা। তাঁর পরনে সাদা পায়জামা-পাঞ্জাবি। মাথায় টুপি। নামাজের সময় ছাড়া ঘরের

বাহিরে মজিদ সাহেব সাধারনত টুপি পড়েন না। কিন্তু আজ পড়লেন। নৌকার ভেতরে ফাতেমা বেগম ও তাঁর ছেলে-মেয়েরা।

ফাহিম পিছনের পর্দার ওপাশে উঁকি দিয়ে মাঝে মাঝে দেখছে। মর্জিনা ও ফিরোজ চুপচাপ। মর্জিনার একটু ভয় ভয় করছে। সে শুনেছে, মিলিটারিরা মেয়েদেরকে নাকি মাঝে মাঝে তুলে নিয়ে যায়। তারা আর ফেরত আসে না। মর্জিনা এবার সপ্তম শ্রেণীতে পড়ে। বরিশালের স্বরস্বতি উচ্চ বিদ্যালয়ে। পড়াশোনায় সে মোটামুটি । যদিও পড়াশোনা নিয়ে তার এখন মাথা ব্যথা নেই। তার চিন্তা মার শরীর নিয়ে। মেজো চাচা বারবার বলেছেন, ভাবিকে যেন ডাক্তার দেখানো হয়। নয়তো আবার স্ট্রোক করতে পারে।

ফিরোজ ভাবছে, তাদের এই বরিশাল যাওয়াটা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে কিনা। যদিও বাবা বলছে, বরিশাল শহর এখন অনেক স্বাভাবিক। মিলিটারি ও জেলা প্রশাসন চেষ্টা করছে মানুষের মধ্য থেকে ভয় কমাতে। কী হবে কে জানে?

ফাতেমা বেগম ভাবছে অন্য কথা। তাঁর চিকিৎসা হওয়াটা জরুরী। কারণ মর্জিনার বিয়ে পর্যন্ত তাঁর বাঁচাটা দরকার। সে তাকালো সামনে বসা মেয়েটার দিকে। খুব সুন্দর দেখতে হয়েছে মেয়েটা। আচ্ছা, জীবন কি তার বিপুল সৌন্দর্য দিয়ে ভরিয়ে দেবে তাঁর মেয়ের জীবন ? যুদ্ধের সময়, সব কিছুই অনিশ্চিত হয়ে পরেছে। আচ্ছা বরিশাল যাওয়া কি ভুল হচ্ছে ?

ফাহিমদের নৌকা ছোট খাল থেকে ধানসিঁড়ি নদীতে পড়লো। নৌকা খুব আস্তে যাচ্ছে। জোয়ারের পানির খুব জোর এখন । নৌকা এক সময় সন্ধ্যা নদীতে পড়লো। নদীর এ জায়গাটা একটু অশান্ত। দুলে দুলে চলছে নৌকা। চার-পাঁচ বছর আগে, এই জায়গায় এক নৌকাডুবিতে মারা গেছে ফাহিমের এক চাচাতো ভাই।

দূরে ঝালকাঠি শহর দেখা যাচ্ছে। ফাহিম বামে তাকাল এবং ফিরোজকে ডাকল, ভাইয়া, দ্যাখ, দ্যাখ । ফিরোজ পর্দা সরিয়ে পিছনের দিকে বের হল। তাকাল বামের চরে। চর যেখানে পানি ছুঁই-ছুঁই করছে সেখানে চার-পাঁচটা মৃতদেহ পড়ে আছে। এক জায়গায় জড়ো হয়ে আছে ওগুলো । দু'টা শকুন দেহগুলোর পাশে। মাংস খাচ্ছে। দুশো গজ দূরে এই একই রকম আরও একটি দৃশ্যের মুখোমুখি হলো ওরা। ফাহিমের খারাপ লাগছে। মাথা ঘুরছে কিছুটা। নৌকার ভিতরে চলে গেল ও।

নৌকা লঞ্চঘাটের দিকে যাচ্ছে। এখানেই বরিশাল-ঝালকাঠি-পিরোজপুর লাইনের লঞ্চগুলো থামে। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে খাকি পোশাকের লোকজন। নৌকা যাচ্ছে আস্তে আস্তে সে দিকে। ভয়ের একটা অনুভূতি ফাহিমের মধ্যে কাজ করতে শুরু করল।

ভাসমান জেটি থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে নৌকা ঘাটের মাটিতে এসে লাগল ফাহিমদের নৌকা। মাঝি বলল, বরিশালের লঞ্চ এখনো আসেনি। কিছুক্ষণের মধ্যে আসবে। আপনারা ঘাটের দিকে যান।

জেটিতে উঠতে একটা চওড়া কাঠের সিঁড়ি। সিঁড়ির আগে বালির বস্তা দিয়ে ঘেরা একটা বাংকার। সেখানে একটি অস্ত্র দেখল ফাহিম। হয়তো মেশিন গান হবে। সেই অস্ত্রের পিছনে চারজন খাকি পোশাক পরা লোক।

মজিদ সাহেব সামনে। এগিয়ে গেলেন তিনি। জেটির টিকিট দিলেন গেটে দাঁড়ান একজনের হাতে। ফাহিম খেয়াল করল, ইউনিফর্ম পরা লোকগুলো এগিয়ে যেয়ে তার বাবার সাথে কথা বলছে। কথা হচ্ছে বাংলা ও উর্দুতে মিশিয়ে। ভাঙ্গা ভাঙ্গা উর্দু বলার চেষ্টা করছেন মজিদ সাহেব।

মজিদ সাহেব তাঁর অফিস থেকে দেওয়া আইডি কার্ড দেখালেন। এক পর্যায়ে হাতের ইশারায় ভিতরে যেতে বলা হল। সবাই একে একে ভেতরে ঢুঁকছে। শেষে ফিরোজ। ফিরোজকে ওরা কাছে ডাকল। মজিদ সাহেব পিছনে পিছনে গেলেন। বললেন, আমার ছেলে।

-সত্যি?

-হ্যাঁ।

তবুও ফিরোজকে একপাশে নেয়া হলো। কারণ, এই বয়সের ছেলেদের মিলিটারিরা সহজে ছাড়ে না। ফিরোজের বয়স তেইশ-চব্বিশ হবে। ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়ে, লাইব্রেরী সাইন্সে। ঢাকার অবস্থা খারাপ দেখে বিশই মার্চ বরিশাল চলে আসে। ইশারায় প্যান্ট খুলতে বলা হলো ফিরোজকে। প্যান্ট খুলল সে। যা দেখার ওরা দেখতে লাগল। একটু দূরে দাঁড়িয়ে মজিদ সাহেব আল্লার নাম নিতে লাগলেন। তিনি বুঝতে পারছিলেন না, তার কি করার আছে ?

ফিরোজকে ছেড়ে দিল মিলিটারিরা। সে জেটিতে উঠল। সমস্ত ব্যাপারটা ঘটে গেল দুই মিনিটের মধ্যে। ফাতেমা বেগমের বুক কাঁপছিল এতক্ষণ। তাঁর মনে হচ্ছিল, সে এখনই ঘুরে পড়ে যাবে। এই সময় ফিরোজ উঠে এলো জেটিতে। তখনই বরিশালগামী একটা লঞ্চ এসে ঘাটে লাগল। সবাই একে একে উঠে গেল লঞ্চে। পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে লঞ্চ ছেড়ে দিল। পানি কেটে ছুটতে শুরু করল বরিশালের দিকে।

দুপুর একটার দিকে লঞ্চ এসে বরিশাল টার্মিনালে লাগল। সবাই নেমে গেল লঞ্চ থেকে। এখানেও গেটের সামনে অনেকজন মিলিটারি। ঝালকাঠির মতো বালির বস্তার আড়ালে বন্দুক নিয়ে ওৎ পেতে আছে। সৌভাগ্য বলতে হবে ওদের, আইডি কার্ড চেক করার পর কাউকে আর দাঁড়াতে বলল না।

ফাহিমরা রিক্সায় উঠেছে। হঠাৎ পেছনে শোরগোল শোনা গেল। ওরা তাকিয়ে দেখে, একটি যুবক ছেলেকে মিলিটারিরা মারতে মারতে পাশে দাঁড়ানো গাড়িতে তুলছে। পাশেই এক বয়সী মহিলাকে চিৎকার করে কান্না করতে দেখা গেল। হয়তো যুবকটি তারই ছেলে।

ততক্ষণে ফাহিমদের রিক্সা দু'টো চলতে শুরু করে দিয়েছে। শ্রীনাথ চ্যাটার্জি লেনের বাসায় ওরা যখন পৌঁছালো, দুপুর দেড়টার মতো বাজে।

(চলবে...)

শাফিন রাশেদ : লেখক ও চিকিৎসক